JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

মধুসূদনের কাব্যে স্বদেশ চেতনা ও জাতীয়তাবোধ

রসরাজ রায়, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চাঁচল কলেজ, চাঁচল, মালদা

Abstract :

Michael Madhusudan Dutta emerged during the British rule. He turned to literature to expose the shame of Subjugation. He started Writing in Bengali on the advise of his friend. He composed the Meghnad Badh epic, inspired by a sense of patriotism. In his Meghnadbadh Kabya, the favourite hero is Meghnad. He was so vocal about his patriotism that he did not hesitate to break the existing norms of society and religion. His writings reflect the themes of subjugation and the weaknesses of national life. He expressed deep regret for the subjugation and was hopeful of regaining the last glory.

Key Words: Madhusudan, British rule, Literature, patriotism, glory.

উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ব্রিটিশ শাসনাধীনে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাই পরাধীনতার গ্লানী উন্মোচনের জন্য সাহিত্যের দ্বারস্থ হলেন। সাহিত্যের আঙ্গিনায় দেশপ্রেম এক ভিন্ন মাত্রা পেল। তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট কাব্য, নাটক ও সনেট জাতীয় রচনায়। ইংরেজী সাহিত্যে তিনি সুনাম, যশ অর্জন করতে চেয়েছিলেন।কিন্তু 'The Captive Lady' এবং 'Visions of the past' লেখার পর ইংরেজী সাহিত্যে তিনি আর খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। যখন তিনি মাদ্রাজে ছিলেন তখন তিনি নিজের মাতৃভাষাও ভুলতে বসেছিলেন যাই হোক বন্ধুদের পরামর্শে মধুসূদন বাংলায় ফিরে এলেন। প্রথমত বাংলায় সঠিক উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে তিনি সে দোষ কাটিয়ে উঠেন। একে একে আমাদের সম্মুখে নিয়ে আসেন 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), পদ্মাবতী(১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)বীরাঙ্গনা কাব্য(১৮৬২), চতুর্দশপদীকবিতাবলী(১৮৬৬),র মতো সৃষ্টির সম্ভার ।

মধুসূদন দত্ত স্বাদেশিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে 'মেঘনাদবধকাব্য' লেখায় সচেষ্ট হন। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্য' -এ নূতনত্বের আভাস পাওয়া যায়।রামায়ণের কবির রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি ও রাক্ষসদের প্রতি বৈরিতা দেখা যায়। কিন্তু 'মেঘনাদবধ' এর কবির মানসিক অবস্থান ছিল ঠিক এর বিপরীতে অর্থাৎ চির পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করে রাক্ষসদের প্রতি সহানুভূতি ও অনুকম্পা দেখিয়েছেন। রাক্ষস পরিবারের স্বজাতি প্রেমে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। কবির নিজের মধ্যে স্বদেশানুরাগ ছিল খুব প্রবল, তাই তাঁর কাব্যে রাক্ষসদের নতুনভাবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। লঙ্কার স্বাধীনতা যখন বিপন্ন হতে থাকে তখন রাবণ স্বদেশ ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পুত্র, পৌত্রদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রাবণ নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'মেঘনাদবধকাব্য' পাঠে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ইংরেজরা পরপার থেকে এ দেশের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করতে থাকে। ভারতবর্ষের বিপ্লবীরাও নিজের দেশের শৃঙ্খলমোচনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যায় । এই দৃষ্টিকোণ থেকে মেঘনাথবধ কাব্য পড়তে হবে, ঐশী ক্ষমতা সম্পন্ন রামচন্দ্র দৈব বলে বলিয়ান হয়ে লঙ্কাপুরি আক্রমণ করে। স্বর্ণলংকার রাবণের চার ধরনের সেনাবাহিনী নিজের মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়। মধুসূদনের প্রিয় বীর ইন্দ্রজিৎ হয়ে ওঠে মেঘনাদবধকাব্য'-র নায়ক।

বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন- **'I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravana kindles my imagination; he was a grand fellow; '** [১]

'রামায়ণ' কে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হলেও মিল্টনের 'Paradise Lost'- এর রচনারীতির ছাপ ও এর মধ্যে স্পষ্ট।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম দুটি লাইনে রাবন কে বিলাপ করতে দেখা যায়-

'সম্মুখ- সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি

বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে' [২]

প্রথম সর্গ থেকেই শোকাহত রাবণের চোখে অশ্রুধারা লক্ষ্য করা গেলেও সপ্তম সর্গে রাবণের মধ্যে বীরত্ব ও যুদ্ধোম্মাদনার উত্তাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এইভাবে-

"যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি,

রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?

বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!

যাও ফিরি; কেন নিবাইবে

এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে; রানি মন্দোদরি?" [৩]

সপ্তম সর্গের মূল সুরই যুদ্ধের সুর শোনা যায়। রাবণ নিজস্ব ক্ষমতায় শত্রু পক্ষকে নাশ করবেন বলে সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মধুসূদনের ইচ্ছে ছিল যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের জয় হবে। কিন্তু নিয়তির দরুণ বাস্তবে মেঘনাদকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তাই অন্যায় সমরে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু দৃশ্য মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। মধুসূদন লিখেছেন -

"It is cost me many a tears to kill my favourite Indrajit" [৪]

- তাঁর লেখনীতে দেশমাতৃকার প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ জাগ্রত হয়ে উঠে। আসলে তিনি ছিলেন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক। তাই তাঁর লেখনীতে পাওয়া যায় স্বাধীনতার পরমসুখ। তিনি স্বদেশ চেতনায় এতটাই মুখর ছিলেন যে সমাজ ও ধর্মের প্রচলিত প্রথাকে ভাঙতে দ্বিধাবোধ করেননি, এমনকি প্রাণ খুলে কলম চালিয়েছেন। অনেক প্রথাকে তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন দাঁড় করিয়েছেন। মধুসূদনের লেখনীতে রামচন্দ্র ভীরু, কাপুরুষ বলে প্রতিপন্ন হয়। মধুসূদনের প্রথাবিরোধী লেখনী গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী ভারতীয়দের মনপুত নাও হতে পারে। যেহেতু তাঁর চেতনায় অহরহ উচ্চারিত হয় দেশমাতৃকার বন্ধন মোচন করতে হবে। তাই তাঁর লেখনিও সেই দিকে মোড় নেয়।

মাইকেল মধুসূদন ছিলেন রেনেসাঁসের যুগের দেশাত্মবোধ ও জাতীয় জাগরণের মূর্ত প্রতীক। তাঁর 'চতুর্দশপদীকবিতাবলী' -তে বেশ কিছু কবিতায় দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনার বিচিত্রতর পরিচয় বহন করে। মধুসূদন দত্ত সুদূর ফ্রান্সে অবস্থান কালে 'চতুর্দশপদীকবিতাবলী' লিখেছেন। মধুসূদন বিদেশে অর্থসংকটে পড়লে তাঁর স্মৃতিচারণায় ভেসে আসে দেশের কথা, বাংলাদেশের শ্রীপঞ্চমীর কথা, আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসবের কথা, বিজয়া দশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপুজোর কথা, জন্মভূমি সাগরদাঁড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদের কথা। এছাড়া পৌরাণিক আখ্যান - উপাখ্যানকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যে দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা মাইকেলের মধ্যে ছিল প্রবল। তাঁর 'চতুর্দশপদীকবিতাবলী'র মধ্যে একটি মাত্র কবিতায় দেশাত্ববোধ সব থেকে বেশী জাগ্রত হয়ে উঠেছে। কবিতাটির নাম 'আমরা'। কবিতায় কবি ভারতের পরাধীনতা ও জাতীয় জীবনের দুর্বলতার কথা ভেবেছেন এবং তার হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য কবিকে ব্যাকুল হতে দেখা যায়। নিম্নে 'আমরা' কবিতার একটি স্তর উদ্‌ধৃত করা হল –

আমরা, – দুৰ্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে? [৫]

- এখানে কবিকে পরাধীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায়। জাতীয় জীবনের দুর্বলতার জন্য কবি চিত্ত আত্মগ্লানী, আত্মধিক্কারে ব্যথিত ছিল।

'কপোতাক্ষ নদ' সনেটটিও মধুসূদন দত্ত স্মৃতিচারণ সূত্রে লিখেছেন। এই কবিতাটি পাঠ করলে মধুসূদন দত্তের স্বদেশ চেতনা ও বাঙালীর জাতীয়তাবোধ খুব সহজে অনুধাবন করা যায়। মধুসূদন ছিলেন উঁচু দরের লেখক তার মতো শক্তিধর কবি বাংলা সাহিত্যে খুব কমই দেখা যায়। মধুসূদনের সৃজনশীলতায় স্বদেশ বিশাল একটা স্থান দখল করে আছে। কবি সুদূর ভার্সাই শহরে থাকলেও তাঁর মন পড়ে থাকে ভারতবর্ষে। বিশেষত বাংলার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকট হয়ে উঠে। স্মৃতিচারণায় রোমন্থন করতে থাকেন শৈশব জীবনের কথা। তাই তাঁর সৃষ্ট 'কপোতাক্ষ নদ' শীর্ষক কবিতায় স্বদেশের একটি নদীর জলকে কবি গর্ভধারিণী জননীর দুধের সঙ্গে তুলনা করেছেন –

সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে,
সতত তোমার কথা ভাবি বিরলে
…..
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ - দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোতোরূপি তুমি জন্ম – ভূমি – স্তনে ![৬]

নিজের জন্মস্থান, মাতৃভূমি কারো পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। তাই 'কপোতাক্ষ নদ'কে কবি সাহিত্যের আঙ্গিনায় নিয়ে এসে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজন কবি নদকে এভাবে ভালোবাসতে পারেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম সংখ্যক কবির মধ্যে দেখা যায়। দেশের কোন নদীকে কাব্যে তুলে আনা শক্তিধর কবির পক্ষেই সম্ভব।

কবিতার নাম 'ভারতভূমি', স্বভাবতই ভারতবর্ষ তথা নিজের দেশের কথাই মধুসূদন বলতে চেয়েছেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানী মধুসূদন মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ভারতবর্ষের জন্য কবির হৃদয়ে আত্মধিক্কার প্রচ্ছন্ন ছিল। তাই ভারতের পরাধীন দশা দেখে মধুসূদন এভাবেই মনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন -

হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা পূর্ণ- স্বর্ণ-জলে। [৭]

এই লাইন উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কবির দেশানুরাগের কথাই আমাদের স্মৃতি পটে ভেসে আসে।

'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি নিজেকে ধিক্কার দেন এবং নিজেকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তোলেন। নিজ ঘরে অমূল্য সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মধুসূদন বিদেশী সাহিত্যকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন।একজন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যে যশস্বী অর্জন করা খুব সহজ নয়, তেমনটা ঘটেছিল মধুসূদনের ক্ষেত্রে। কবির মানসিক বেদনাবোধ থেকে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির জন্ম। আলোচ্য কবিতায় তিনি আত্ম-উপলব্ধি তুলে ধরেছেন এইভাবে -

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমন
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
....
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে-খনি, পূর্ণ মণিজালে।। [৮]

মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে মধুসূদন খনি পূর্ণ মণিজালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মাতৃভাষা বাংলা তাঁর কাছে অনন্ত রত্নের উৎস। খনি থেকে যেমন মনি পাওয়া যায় তেমনই কবি বাংলা ভাষার মধ্য থেকে সুকাব্যের মনি আহরণ করেছেন। যে মধুসূদন একটা সময় বাংলাকে উপেক্ষা করেছেন, আজকে কবিকে ব্রাত্য রেখে বাংলা সাহিত্য অচল।

'পরিচয়' কবিতাটিতে প্রারম্ভিক সূচনায় দেশানুরাগের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এই কবিতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয় ও শ্রেষ্ঠ নদী জাহ্নবীর আবেগময় বর্ণনা তিনি করেছেন -

জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ মণ্ডলে [৯]

'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা' কবিতায় কবি-মানস স্বদেশীয় আমোদ- উৎসবে ব্যাকুল। হিন্দু বাঙালির ঘরে ঘরে বন্দিত লক্ষ্মী পূজাকে মধুসূদন নিজের লেখনী সত্তায় কাব্যিক রূপ দান করেছেন -

'থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে' [১০]

মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁর রক্তের স্রোতে স্রোতে এদেশীয় সংস্কার সংস্কৃতি মিশে আছে ।তাই তাঁর লেখনীতে এদেশের কথা বারবার এসেছে। ভিন দেশে তিনি থাকলেও এদেশীয় উৎসবের প্রতি তাঁর আত্মিক টান ছিল। তাই লক্ষ্মী দেবীকে কবি চিরকাল বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

'সমাপ্তে' কবিতায় কবি মন বৈষয়িক উন্নতি ও কাব্যসাধনার টানাপোড়েনে ছিন্ন ভিন্ন। দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ কবি চিত্ত বিষাদে ভরপুর, কবি চোখের জলে ভাসিয়ে দুঃখের সঙ্গে উচ্চারণ করেন-

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,-

জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ-ভারত-রতনে। [১১]

তিনি দেবীর কাছে নিজের জন্য কিছুই চাননি। বিদায় বেলায় কবি দেবীর নিকট নিজের অন্তিম ইচ্ছে পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন, দেবী যেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে জ্যোতির্ময় করে তোলে। কবির বর চাওয়ার মধ্য দিয়ে স্বদেশের প্রতি সুতীব্র ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে।

রোমক কবি ওবিদকে অনুসরণ করে লেখা মধুসূদন দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা'। কাব্যটিতে মধুসূদন দত্ত নিজের সৃজনশীলতায় পৌরাণিক কাহিনীর নারীদের পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলেছেন। নারীরা পুরুষ পরিচালিত নিয়মের, সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে কবি নারীদের স্বদেশ চেতনার প্রতীক হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নারীদের প্রতি মধুসূদনের সহমর্মিতা থাকায় নারীর পক্ষাবলম্বনে নারীদের কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি জানতেন নারী জাতির উন্নয়ন ব্যতীত স্বদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বীরাঙ্গনা কাব্যে কবি নারীদের প্রতিবাদী সত্তা উদঘাটন করেছেন।

মধুসূদন দত্তের সৃজনশীলতায় জাতীয়তাবাদ বারবার উঠে এসেছে। তাঁর সাহিত্যে স্বদেশ চেতনার প্রতিফলন যেমন ঘটেছে তেমনি বাঙ্গালী চেতনায় জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হতে দেখা গিয়েছে। তাঁর সাহিত্য পাঠ ব্যতীত সাহিত্যে মধুসূদনের দক্ষতা কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি দেখেছেন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছেন পরাধীনতার গ্লানী। তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট রচনাবলীতে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসুদনের সমসাময়িক যুগের সাহিত্যিক। বহিরঙ্গে মধুসূদন ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন মত গ্রহণ করলেও অন্তরঙ্গে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙ্গালী। তার অন্তরের বাঙ্গলীয়ানা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রও ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেজন্যই তো কবির মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন যে, মধুসূধন দত্তের বাঙ্গালীয়ানা নিয়ে কোন সংশয় ছিল না।

মধুসূদন সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে যে, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর হার্দিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু ১৮৭১ সালে ঢাকায় তাকে এক নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে কবি আবেগাপ্লুতভাবে বলেছেন -

"আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোনো ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে একখানি আরশি রাখিয়া দিয়াছি। এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যখন বলবৎ হয় তখন অমনি আরশিতে মুখ দেখি। আমি শুধু বাঙ্গালি নহি। আমি বাঙ্গাল। আমার বাটি যশোহর।"[১২]

কোলকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডের ধারে অবস্থিত সমাধিফলকে কবির সেই চিরস্মরণীয় উক্তি -

"দাঁড়াও, পথিক বর, জন্ম যদি তব

বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে।[১৩]

সমাধিফলক কবির মৃত্যুর পূর্বে লেখা। নিজের দেশ, মাতৃভাষাকে কবি সম্মান, শ্রদ্ধা করতেন তাই তার পক্ষেই শুধু সম্ভব এইরূপ ফলকে লিখা।

তথ্যসূচিঃ

১। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" – সম্পাদক- শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" – সম্পাদক- শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" – সম্পাদক- শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" – সম্পাদক- শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' – সম্পাদক - শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

৬। মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' – সম্পাদক - শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

দত্ত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' – সম্পাদক - শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

৭। মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' – সম্পাদক - শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

৮। মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' – সম্পাদক - শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

৯। মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' – সম্পাদক - শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

১০। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম' - অঞ্জলি কাঞ্জিলাল (মডার্ন বুক)

১২। বিশেষ বক্তৃতা, ঢাকা, সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, ১৮৭১

১৩। বিবিধ কাব্যগ্রন্থ, মধুসূদন দত্ত, ১৯৪০

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" – সম্পাদক- শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' – সম্পাদক - শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম - অঞ্জলি কাঞ্জিলাল ।